ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1616-1633
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.383

টুসু: কৃষি উৎসব ও ধনলক্ষ্মীর লোকায়ত স্বরূপ

রঞ্জিত কুমার মাহাত, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ওয়াই. বি. এন. বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খন্ড, ভারত*
ড. চন্দ্র শেখর হালদার, *তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ওয়াই. বি. এন. বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খন্ড, ভারত*

Received: 23.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Tusu Utsav or Makar Manbhum is the most popular folk festival of the Jharkhand region. Although the word Tusu is a regional form, Makar or Makar Sankranti is known as a pan-Indian festival today. Not only that, people outside the agricultural culture also take holy baths and celebrate festivals in various ways on Makar Sankranti. However, the scale and importance of this festival is not seen anywhere else in Manbhum, or the greater Jharkhand region. While in other regions the festival lasts for one day, in this region it begins on Agrahayana Sankranti and ends on Paush Sankranti. The work of harvesting and bringing rice into the house of the peasant community basically ends on the day of Agrahayana Sankranti. On that very day, Dini Thakuran or Dhanalakshmi is brought into the house. A paddy field is given to her. A sturdy stalk of the rice plant is collected and placed in an earthen vessel. With great purity, the girls place the goddess Tusu or Dhanalakshmi in a clean niche. This rice sheaf is called Tusu or Dhanalakshmi and the day of Agrahayana Sankranti is called Chota Makar. The Tusu or Makar festival began from that day. From that day on, every night, the girls gather near the goddess Tusu or Dhan Devi and worship her with Geet Anjali. This goes on for a month. Then, on the day of Paush Sankranti, the rice husk is replaced with a broad cloth and immersed in a pond, water body or river while singing songs.

Keyword - Tusu, Makar, Dini, Choudal, Tusu Geet

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলাকে বলা যায় নৃত্য, গীত ও পরবের দেশ। আর এই পরব বা লোক উৎসবগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় লোক উৎসব টি হলো মকর বা টুসু পরব। কেবল জনপ্রিয়তায় নয়, টুসু উৎসবের ব্যাপকতা ও সর্বজন তা এমনি যে, একে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার জাতীয় উৎসব আখ্যা দেওয়া যায়। আর ভৌগোলিক বিস্তৃতি তো বটেই, পুরো একমাস জুড়ে উৎসবের ব্যাপ্তি এবং ঘরে ঘরে মানুষের উন্মাদনা,

জনমান্য তার বিচারে টুসুকে সীমান্ত বাংলার কেবল উৎসব নয় মহোৎসব বলা উচিত। এই মহোৎসবের প্রাণের আবেগটা বড় সুন্দর ভাবে ধরা পড়ে টুসু গীতে। -

গীত

"এত বড় পোষ পরবে
রাখলি মা পরের ঘরে
পরের মা কি বেদন জানে
জ্বালায় গো আমার প্রাণে।
শশুর ঘরে মন কেমন করে
যেমন শোল মাছে উফাল মারে।।"[১]

টুসু যে এই অঞ্চলের কৃষি জীবি প্রান্তিক খেটে খাওয়া মানুষের একান্তই প্রাণের উৎসব তা উপরোক্ত গীতটি থেকে বোঝা যায়। কিন্তু মকর বা টুসু শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? বা এই উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্যটিই বা কি এই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিবাদ ও বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন টুসু উৎসব হলো বাংলার তুষ-তোষলা মেয়েলি ব্রতেরই ঝাড়খন্ডী রূপ। আবার কেউ বলেন টুসু হলেন শস্যদেবী অর্থাৎ ধনলক্ষী। কেউ বলেন এটি হলো একান্তই শস্য উৎসবক ফসল তোলার উৎসব এমনকি বলা হয়েছে টুসু সব শস্যের মরণোৎসব। কিন্তু কারো কারো মতে টুসু হলো এই অঞ্চলের মেয়ে বা মা। এই উৎসব তাদেরই প্রাণের প্রতীক। একান্তই নারীরা এই বিভিন্ন বিবাদ ও মতাদর্শ প্রসঙ্গে কার কি অভিমত তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। ড. সুধীর কুমার করন তাঁর 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থে টুসু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন-

> "বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তোষ-তোষলা বা তুষু নামক ব্রতের প্রচলন আছে। পূর্ববঙ্গে-পশ্চিমবঙ্গে দু জায়গাতেই মেয়েরা এই ব্রত করে থাকে।"[২]

তুষু বা তোষলা পরবের নামকরণের মূলে তিষ্যা নক্ষত্রের প্রভাব থাকা কিছু অসমীচীন নয়, তবে এ কথাও স্বীকার করা যেতে পারে যে মূলত 'তুষু' শব্দের সঙ্গেই এর যোগাযোগ, ধানের তুষ, তুমু ব্রতের একটি অপরিহার্য উপকরণ। গরুর গোবর, সরষে ফুল, নতুন ধানের তুষ প্রভৃতি উপকরণকে আদিম মানুষের যাদু প্রক্রিয়ার উপকরণ হিসেবেও গ্রহণ করা চলে। বলা বাহুল্য এর সঙ্গে দুর্বলতা বাদের যোগ সূত্রটি সুস্পষ্টী গোবরের নাড়ুর উপর তুষ ছড়িয়ে শূন্য গর্ভ তুষের ভেতর থেকে পূর্ণ শস্য ধানের কামনাটি অস্বাভাবিক নয়। তুষ বা তোষলা ব্রত সম্পর্কে বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: প্রতিদিন পৌষ মাসের সকালে মেয়েরা এই ব্রতটি করে। ব্রতের বিধি এই অঘ্রাণের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি সকালে স্নান করে গোবরের ছ-কুড়ি ছ-গন্ডা বা একশো চুয়াল্লিশটি গুলি পাকিয়ে, কালো দাগ শূন্য নতুন সরাতে বেগুন পাতা বিছিয়ে তার উপরে গুলি কটি রাখতে হয়। তার উপর নতুন আলো চালের তুষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, সরষে, শিম, মুলো ইত্যাদির ফুল দিয়ে ছড়া বলা হয়। ব্রতের নাম এবং উপকরণ গুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এটি সার মাটি দিয়ে ক্ষেত উর্বর করে তোলার ব্রত।

ড. করন এই মতকে সমর্থন করলেও ঝাড়খন্ড লোক সংস্কৃতির অন্য এক প্রথিত যশ্য অধ্যাপক ড. বঙ্কিম মাহাত তার মতকে সমর্থন করেননি। তিনি সরাসরি এর বিরোধিতা করেছেন। 'ঝাড়খণ্ডের লোক সাহিত্য' গ্রন্থে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন:-

> "টুসু যে বাংলার তোষলা ব্রতের ঝাড়খন্ডি রূপ নয়, তাল তলিয়ে বিচার করলে বোঝা যায়। যে কোনো ব্রতের আচারেই মৌলিক পরিচয়, ছড়া কিংবা প্রার্থনা মন্ত্র পরবর্তী কালের

> সংযোজন। ঝাড়খন্ড যদি বাংলার তোষনা ব্রতকে গ্রহণ করে থাকত তাহলে ছড়াটিও গ্রহণ করত। টুসুর মধ্যে এই ব্রতের আদিমতম রূপটি পাওয়া যায়, যা বাংলার তোষলা ব্রতের মধ্যে নেই।.....বরং এখনকার টুসু ঝাড়খণ্ডের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উঁচু বর্ণের লোকেদের মধ্যে প্রচার লাভ করে উন্নত পর্যায়ের তোষলা ব্রতে পরিণত হয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক।"[৩]

ড. বঙ্কিম মাহাত এর যুক্তিটি অত্যন্ত বাস্তব এবং তথ্যনিষ্ঠ। অন্যপক্ষে টুসু ও তুষু উৎসবের জন মান্যতা ও ব্যাপকতা বিচার করলেই এই সত্যটি আরও পরিস্ফুট হয়। সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় এক একটি টুসু মেলায় হাজার নয় লক্ষ মানুষের উপস্থিতি, জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এর জনমান্যতা, আর মাত্র কয়েকটি ছড়া দিয়ে তোষলাকে টুসুর উপরে বসিয়ে স্থান দেওয়া একপ্রকার সাম্রাজ্যবাদী চাপিয়ে দেওয়ার অভিসন্ধি বলেই মনে হয়। ঝাড়খণ্ডের সারা বছরের সমস্ত উৎসব কৃষির সঙ্গে জড়িত উৎসব। টুলু উৎসবটি বাংলাদেশ বা বাংলা সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এই ভাবনার মধ্যে ভুল ও বিভ্রান্তি থাকায় স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গে এই অঞ্চলের অপর একটি বিশিষ্ট গবেষক ড. ক্ষিরোদ চন্দ্র মাহাতোর বক্তব্যটি অনেকটায় যুক্তিপূর্ণ এবং মূল সত্যটিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। 'মানভূমের টুসু পরব' সংকলন গ্রন্থে তাঁর প্রবন্ধ- 'মানভূমের টুসু পরব নৃতত্ত্বের আলোকে' তে বলেছেন- আসলে একটা দিক স্পষ্টতই বোঝা যায়, টুসু মানভূম সহ সীমান্ত বাংলার মানুষের চেতনায় লক্ষ্মীরই আরেক রূপা জল-জমি, জঙ্গল কেন্দ্রীক মানুষজন টুসু-র মধ্যে কল্পনা করে এসেছে তারই ছায়া। সে জন্য অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন মাঠের ফসল ঘরে তোলার পর শুরু হয় টুসুর বোধন্য তুলসী মঞ্চের এক পাশে গর্ত খুঁড়ে বা দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে গাঁদা ফুল দিয়ে পাতানো হয় টুস। সেই দিন থেকে পুরো পৌষ মাসজুড়ে প্রতিদিন একটি করে গাঁদা ফুল দিয়ে টুসুকে সাজিয়ে রাখা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় মেয়েরা সমবেত হয়ে টুসু গান গায় দীর্ঘ একমাস চলে আসা টুসু ব্রতের সমাপ্তি ঘটে পৌষ সংক্রান্তির দিন টুসুর বিসর্জনে। টুসুর বিসর্জন উপলক্ষে চলে মেলা। টুসুর গানে যেমন মুখরিত হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ তেমনি মনোহারি দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা দোকান সাজিয়ে বসে। কেনা বেচা চলে প্রসাধনী সামগ্রীর সঙ্গে সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্রের সব মিলিয়ে টুসু পরবের দিন মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। পৌষ সংক্রান্তির দিন টুসুর বিসর্জন উপলক্ষে সাবেক মানভূম সহ তামাম দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার জন মানসে জাতীয় উৎসবের চেহারা নেয়। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন-

> "জাতীয় উৎসব বলিতে যাহা বুঝায় এবং পুরুলিয়ার টুসু উৎসবের মধ্যে আমরা আজও যাহা দেখিতে পাই নাই তাহার রূপ পূর্ব বাংলা কিম্বা পশ্চিমবাংলার কোথাও দেখা যায় না। ইহার কারণ সামাজিক সংহতি ব্যতীত জাতীয় সম্ভব হয় না। পুরুলিয়ায় এখন পর্যন্ত সমাজ জীবনের যে সংহতি বর্তমান আছে, বাংলাদেশের আর কোথাও তাহা নাই, সেই জন্য জাতীয় উৎসবের রূপ, এই অঞ্চলেই এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্য কোথাও নহো সেই জন্য শস্যোৎসব বলিতে যাহা বুঝায়, পুরুলিয়া ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার আর কোথাও নাই।"[৪]

ড. ভট্টাচার্য প্রকৃত সত্যের কাছে পৌঁছেছেন। এই উৎসবের সংহত রূপটি কেবল পুরুলিয়া এবং সীমান্ত বাংলাতেই রয়েছে আর কোথাও নয়। তাই এই উৎসবের তাৎপর্য টিকে পূর্ববঙ্গে বা তুষ-তোষনার ভিতরে খোঁজা হবে সবচেয়ে ভুল। আসলে পণ্ডিতগণ তুষ শব্দের অর্থ বুঝতে পারলেও টুসু এবং মকর শব্দের অর্থ ও তার তাৎপর্যের বিষয়টিকে তলিয়ে দেখেননি। এখানেই বিভ্রান্তি। উর্বরতা বাদের তত্ত্ব, ধন লক্ষ্মীর ভাবনাটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিষয়টি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে সূর্যের উত্তরায়ণ থেকে দক্ষিণায়ন

যাত্রা এবং সূর্য দেবতার পূজা আরাধনা ও জাড়ুত রয়েছে। জাওয়া করমে সূর্যের বিষুব হওয়া এবং আখানে দক্ষিণায়নের সূচনা সীমান্ত বাংলার কৃষি উৎসবগুলির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যটিকেই তুলে ধরে।

এই অঞ্চলে টুসু উৎসবের অন্যতম জনপ্রিয় নামটি হলো মকর পরব। মকর শব্দটি কে পণ্ডিতগণ কেবল মকর রাশি বলেই বিবেচনা করেছেন। কিন্তু কেবল তাই নয়, রাজস্থানী, গুজরাঠী সহ ভারতীয় বহু ভাষাতে মকর শব্দের অন্যতম অর্থ হলো সূর্য। জাওয়া-করম উৎসবে ঈদ দেবতা কেও ইন্দ্র হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয় যা পুরোপুরি ভুল। ঈদ অর্থেও সূর্য দেবতাকেই বোঝায়। এই অঞ্চলের মানুষ শস্য উৎপাদনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সহায়ক শক্তি সূর্য দেবতার সূচনা করেছে তার অবদানের জন্য তিনি ব্যতিরেকে এই সৃষ্টি বেঁচে থাকতে পারে না, তাই তার পূজা আরাধনা। আর টুসু শব্দটি কে যদি আমরা কুড়মালি 'টুই' ও 'সু' শব্দের সংযোগে গঠিত বলে মনে করি তাহলে এই ব্যাখ্যা আরো সম্পূর্ণতা পায়। টুই শব্দের অর্থ দাঁড়ায় সূর্যের শেষ সীমায় অবস্থান। ঐ দিনটি হলো মকর। পরদিন আখান হলো তার শুভ উত্তরায়ন যাত্রা। আসলে উৎসবটিতে ধনদেবী ধান শীসটির সঙ্গে সূর্যের পূজাই হলো টুসু ও মকর উৎসবের মূল বিষয়। তুষ বা তোষলা ব্রতের সঙ্গে এর সম্পর্কটি একেবারেই গৌণ। সূর্য পূজার এই সম্পর্কটির প্রসঙ্গে ড. বঙ্কিম মাহাত তাঁর ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য গ্রন্থে আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধির একটি উল্লেখ যোগ্য বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন- আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন যোন শত বৎসর পূর্বে পৌষ সংক্রান্তির দিন উত্তরায়ন আরম্ভ হইল। পরদিন ১লা মাঘ নতুন বৎসরের প্রথম দিন। সেদিন আমরা দেব খাতে প্রাতঃস্নান করি। লোকে বলে মকর স্নান। এই প্রসঙ্গে ড. মাহাত এর বক্তব্যটি হলো-

> "তার মতে ৩১৯ খ্রিস্টাব্দে পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তরায়ন হত। মকর পরব যে ঝাড়খণ্ডের নববর্ষ উৎসব, তাতে কোন সন্দেহ নাই।"[৫]

লোকসংস্কৃতিবিদগণ টুসু উৎসবের এই বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক ঐতিহাসিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব নিয়ে জাওয়া-করম এবং টুসুকে একটি মেয়েলি ব্রত হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং বিষয়টিকে একেবারে লঘু করে দেখেছেন। রায় বিদ্যানিধি মহাশয় ১লা মাঘে নতুন বর্ষের কথা বলেছেন কিন্তু সেটি কোন ক্যালেন্ডার বা কার নববর্ষ? এতো কুড়মালি নববর্ষের কথায় তিনি বলেছেন। যে কথা আমরা বার বার বলেছি। কুড়মালি কৃষি সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস ও তার পরম্পরাটি এবং এই কৃষিকে কেন্দ্র করে তার সাংস্কৃতিক পরম্পরাটিকে সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত, যা করা হয়নি। এই লোকোৎসবগুলি কেবল মেয়েলি ব্রত বা মেলা পার্বণ নয় এর ভেতরে রয়েছে এই সমাজ ও সভ্যতার বহু অকথিত কাহিনী ইতিহাসের নিরব কথা।

পুরুলিয়ার বিখ্যাত লোক গবেষক কিরিটি মাহাত 'মানভূমের টুসু পরব' সংকলন গ্রন্থে 'লোক বিজ্ঞানের আলোকে টুসু উৎসব' প্রবন্ধে বলেছেন- মকরের স্নানোৎসব রীতি ও ঐতিহ্যটি কেবল সর্বভারতীয় নয় বহু প্রাচীন ও বলা যায় প্রাগ-ঐতিহাসিক। কারণ ভারতবর্ষের প্রাচীন কৃষি সভ্যতার কেন্দ্র সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতাতেও এই অনুষ্ঠানটি অর্থাৎ সমবেত স্নান উৎসব পালন করা হতো এমন অনুমান করেছেন পুরা তত্ত্ববিদ ও প্রত্ন বিজ্ঞানীগণ। এই প্রসঙ্গে আমরা সস্মরণ করতে পারি পৃথিবী বিখ্যাত প্রত্ন বিজ্ঞানী G.L. Possechi এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন-

> "That such emphasis should have been placed on batting even in this remote age in not a surprise given the importance the Indian has attached to ceremonial ablutions in saered tanks, pools and rivers since time immemorial."[৬]

সিন্ধু সংস্কৃতির সর্বভারতীয় স্বরূপের এটি একটি বড় প্রমাণ। এতে গেল সর্বভারতীয় স্বরূপ। কিন্তু টুসু উৎসব বা নববর্ষ উৎসবের পাঁচদিনব্যাপী এই আনন্দ উৎসবের উদযাপনের রীতিটি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল আন্তর্জাতিক। মানব সভ্যতায় কৃষি এবং কৃষি বর্ষোৎসবের এ রীতিটি ভারতবর্ষ থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে কি না তা অবশ্যই আরও গবেষণা সাপেক্ষ বিষয়। তবে তা হওয়ায় স্বাভাবিক। কারণ বিখ্যাত ভারত তত্ত্ব বিদ এ.এল. বশম অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন- "প্রাক আর্য যুগে এদেশে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল এর জন্য সারা বিশ্ব ভারতের কাছে ঋনী"। এত প্রসঙ্গ অবতারণার কারণ সুদূর মিশর সভ্যতায় টুসু বা মকরের মতোই ৫দিন ব্যাপী বর্ষ শেষে আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন রীতি ছিল তা বলা হয়েছে গ্রগোরি বেনগাদ লেভিনের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থে। লেভিন বলেছেন- প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার মানুষেরা জানও সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ৩৬৫ দিনে। তাদের ক্যালেন্ডার ছিল বারটি মাসে বিভক্ত এবং এক একটি মাস ছিল ৩০ দিন নিয়ে।

বাকি পাঁচটি দিন তারা ভূরিভোজন ও আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে থাকত। দুটি দেশের দূরত্ব অনেক হলেও বিষয়টি একেবারেই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। কারণ ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ এই মিশরীয় সভ্যতা কে বহিরাগত সভ্যতা বলেই দাবি করেছেন"। (পৃ. ৫২,৫৪) এইগুলি কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। বিষয়টি বিশেষ ভাবেই গবেষকদের ভেবে দেখা উচিত। কৃষি সভ্যতার ফসল হলো এই লোকোৎসব গুলি। তাই উৎসব গুলির মধ্যে কৃষি সভ্যতার নানা বিষয় ও নানা কথা এর ভেতরে লুক্কায়িত থাকবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মানুষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অজ্ঞানতা বা অন্ধ বিশ্বাস সবকিছুতে খোঁজা হবে নির্বুদ্ধিতা।

গীত

"জলে হেল জলে খেল, জলে তোমার কি আছে
আপনার মনকে সুদ্ধাঞ দেখ, জলে শশুর ঘর আছে।"[৭]

এই গীত ইঙ্গিত করে টুসুর অনেক কিছুর ভিতরেই রহস্য ময়তা রয়েছে। অন্তর্নিহিত সত্য কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। জলে শশুর ঘর থাকাকে যদি বলেন, এ হলো পাগলের প্রলাপ তাহলে তবে তা হবে আমাদের বোকার অক্ষমতা।

একমাত্র একটি ধান শিস জলে হেলে এবং জ্বলে খেলে যার শশুর ঘর হলো জলে। রূপক উপমা অলংকারের শোভায় সংগীতটির দুটি পক্ষতি শোভিতা সেই ধান শিসটিই হলো টুস। টুসু উৎসবের প্রকৃত সত্য ও তাৎপর্য কে খুঁজে পেতে হলে ভারতের কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতিকে ভালো করে বুঝতে হবে। তার ইতিহাস ও পরম্পরাকেও সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হবে। এভিন্ন হবে অন্ধের হস্তি দর্শন। বিভিন্ন গবেষক ও পন্ডিত জনের উপরোক্ত মন্তব্য গুলি অন্তত সে কোথায় প্রমাণ করে।

টুসু লোক পূরান কথা:-

জাওয়া-করম বা সহরই-বাঁদনা নিয়ে যেমন প্রাচীন লোক পুরান কথা রয়েছে সে অর্থে টুসুকে নিয়ে কোন প্রাচীন লোক পুরান কথা নাই। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কাহিনী ও কিংবদন্তি শোনা যায় যা তলিয়ে দেখলে তুলনা মূলক অর্বাচীন বলে মনে হয়। অন্যান্য কৃষি উৎসবগুলির মতোই টুসুও হলো একটি প্রাচীন কৃষি উৎসব এবং কৃষি সভ্যতার অভিন্ন অন্ধ তাই কোন কাহিনী বা কিংবদন্তিতে তা যদি অন্যভাবে পরিবেশিত হয় তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আসলে মানুষ যে কোন জিনিস জানতে গেলে তার উৎস ও ইতিহাসের অনুসন্ধান করে। এটাই স্বাভাবিক। যখন তা জানা যায় না, তখন নিজেরাই মনের বিশ্বাস ও

মাধুরী মিশিয়ে রচনা করে তার কাহিনী। টুসু উৎসবের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিই ঘটেছে। তবে এই কিংবদন্তি গুলি যখন বিদগ্ধ পন্ডিত জনের গ্রন্থে স্থান পায় তখন তাকে কিছুটা হলেও মূল্য দেওয়া ছাড়া পথ থাকে না। ড. সুধীর কুমার করন অনুরূপ একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ 'সীমান্ত বাংলার লোকযানে'। তিনি হুবহু যা বলেছেন বা লিখেছেন তা নিম্নে দেওয়া হলো।

> "টুসু সম্পর্কে একটি লোককথা প্রচলিত আছে মানভূমের কোন কোন অঞ্চলে। লোক কথাটি বহু প্রচলিত নয় বলেই এর মৌলিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। লোক কথাতে বলা হয়:-কর্মী সমাজে এক রূপবতী কন্যার ডাক নাম ছিল টুসু, ভালো নাম রুকমিনী। কন্যাটি রূপে গুণে লক্ষীর মতো। এক কর্মী যুবকের সঙ্গে তার বিবাহের কথা নির্ধারিত ছিল। রুকমিনী আর সেই কর্মী যুবক সম্পর্ককে গভীরভাবে ভালোবাসতো আগে থেকেই। এদের বিবাহ উৎসবের তিথি যত ঘনিয়ে আসে, তত খুশি হয় কর্মী সমাজের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাই। কিন্তু বিবাহ তিথিতে বিবাহ কার্য শেষ হওয়ার পূর্বে মুসলমানরা এসে অন্যান্য ধন-সম্পত্তির সঙ্গে লুঠ করে নিয়ে যায় তাদের। মুসলমানদের অভক্ষ শূকর মাংসে এদের প্রীতি আছে শুনে, শেষ পর্যন্ত তারা এদের অস্পৃশ্য জ্ঞানে বর্জন করে। রুকমিণী এবং সেই কর্মী যুবক যখন গ্রামে ফিরে আসে তখন কর্মী যুবকের অভিভাবকেরা রুকমিণীর সঙ্গে তার বিবাহে বাধা দেয়। যে মেয়েকে মুসলমান ছুঁয়েছে, সে মেয়ের সঙ্গে কারুরেই বিয়ে হতে পারে না। কিন্তু এর ফলে তাদের পারস্পরিক প্রেম মোটেই ব্যাহত হয়নি। কর্মী যুবকটি অভিভাবকদের মত পরিবর্তন করতে না পেরে মনের দুঃখে বনে যায়, সন্ন্যাসী হয়ে। এদিকে রুকমিণী অনাহারে অনিদ্রায় দিনাতি পাত করতে থাকে, আর কি করে তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হবে এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। একদিন সবাই শুনলো টুসুমনি ঘর থেকে নিরুদ্দেশ। কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। রুকমিনীর ডাক নামটাই বেশি প্রচলিত ছিল দেশে। ফলে ঘরে ঘরে শুধু টুসুর আলোচনা। ভালোবাসার ধনকে ফিরে পাবার জন্য টুসুর গৃহত্যাগের কাহিনী কুমারী মেয়েদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। টুসু তাদের আদর্শ হয়ে উঠলো। অবশেষে একদিন সবাই শুনলো প্রস্তুত আর বরকে খুঁজে পেয়েছে, সুবর্ণরেখা নদীর তীরে। টুসুর একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। চারদিক থেকে সবাই ছুটে চললো। টুসুকে দেখতে, ইচাগড় থানার সতী ঘাটায়। সুবর্ণরেখার একটি ঘাটে তারা দেখতে পেল টুসুকে আর সেই সন্ন্যাসী বেশি বরকে। লোকের আনন্দের অবধি রইল না। কিন্তু এত আনন্দ সইল না। অনাহারে অনিদ্রায় প্রচুর স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছিল। বাঞ্ছিতকে পাবার পরেই তার মৃত্যু ঘটে সেইখানে। বঞ্চিতের জন্য টুসুর এই আত্মবিসর্জনকে কর্মী বা মাহাতো সম্প্রদায়ের মেয়েরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে চলেছে আজও। ইচাগড় থানায় (বর্তমানে সিংভূম জেলার অন্তর্গত) সতীঘাটায় আজও টুসু উৎসব উপলক্ষে বিরাট জন সমাবেশ হয়।"[৮]

ড. করণ কাহিনীর শুরুতেই বলে দিয়েছেন যে, কাহিনীটি বিশেষ বিশেষ কিছু অঞ্চলে এবং কিছু মানুষের মধ্যে প্রচলিত রইলেও গোটা টুসু উৎসবের মানুষের মধ্যে প্রচলিত নয় বা সর্বজন পরিচিত, সর্বজন মান্য কোন কাহিনী নয়, তাই লেখক নিজেই কাহিনীটি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রাচীন এই কৃষি উৎসব গুলি দুই-পাঁচশত বৎসরের ঘটনা নয়। উৎসবগুলির আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার, বিশ্বাসগুলি যে পরিচয় বহন করে তা কেবল হাজার নয় হাজার হাজার বৎসর প্রাচীন বলেই অনুমান করা যায়। দ্বিতীয়ত এত বড়, সার্বজনীন একটি লোকায়ত উৎসব কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের ঘটনা বলে মেনে নেওয়াটা কঠিন। এছাড়াও উপরোক্ত ঘটনাটি নিছকই একটি প্রেম কাহিনী। কিন্তু টুসু উৎসবের সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে

লুকিয়ে রয়েছে কৃষির সম্পর্ক। যে সম্পর্কিত আচার-নেগ। তাই কাহিনীটি কাশীপুরের রাজা এবং তার কন্যা ভদ্রাবতীর যে কাহিনী পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে এই কাহিনীটি ও অনুরূপ একটি মিথ বা কল্পকাহিনী মাত্র। আসলে একটি প্রাচীন উৎসবের অর্থ এবং তার তাৎপর্য মানুষ যখন আর যোগসূত্রগুলি খুঁজে পায় না তখন মনগড়া কাহিনীর সৃষ্টি করে নিতে বাধ্য হয়। টুসুর কাহিনীটিও তেমনি। এছাড়াও ড. সুভাষ রায় আর একটি কিংবদন্তি উল্লেখ করেছেন 'মানভূমের টুসু পরব' গ্রন্থে তাঁর টুসুকে কেন্দ্র করে কাহিনী ও কিম্বদন্তি প্রবন্ধো কাহিনীটি নিম্নরূপ-

এক কুড়মি রাজা ও তার স্ত্রী ১২ বৎসর তপস্যা করে এক কন্যা সন্তান লাভ করে। কন্যাটি ছিল পরমা সুন্দরী। মা-বাবা কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে আদর করে তার নাম দেন টুস। টুসু রূপে গুনে ক্রমশ বড় হতে থাকে। বাল্যকালেই টুপুর খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ শখ ছিল বাগান করার। মাতা-পিতা তার এই ঝোঁক দেখে কন্যার জন্য খুব সুন্দর একটি ফুল ও ফলের বাগান তৈরি করে দেন। সারাদিন খেলাধুলা আর ঐ ফুলের বাগানেই তার সময় কাটত। তখন দেশে চলছিল মুসলমান শাসন। দিল্লী ও গৌড়ে তখন মুসলমান নবাব। ঠিক এই সময় একটি ঘটনা ঘটে। গৌড়ের নবাবের রাজ মহিষী এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বহু চিকিৎসক কে তাকে দেখানো হয়, কবিরাজ দেখানো হয় কিন্তু তার রোগ আর সারে না। নবাব এর কোন কূল-কিনারা করতে না পেরে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। অবশেষে একদিন এক জ্যোতিষী এসে নবাবকে বলেন, কোন রমণীর হাতে লাগানো পুকুরে এবং গাছে পাকে না এমন আম যদি জোগাড় করতে পারেন তাহলে তার থেকে ওষুধ তৈরী করে রাজমহিষীকে সেবন করালে তাঁর রোগ সেরে যাবে এবং তিনি বেঁচে যাবেন। জ্যোতিষীর কথা শুনে নবাব চারিদিকে লোক লস্কর পাঠালেন এমনতর বস্তু দুটি আনার জন্য নবাবের রাজত্ব যতদূর বিস্তৃত তার চারিদিকে ঢেঁড়া পিটিয়ে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হলো জিনিসগুলি সম্পর্কে আর বহু মূল্য পুরস্কার ঘোষণা করে দেওয়া হলো যে সন্ধান দিতে পারবে তার জন্য। একদিন সেই নবাবের ঘোষক এসে পৌঁছালো কুড়মিদের গ্রামে। সংবাদটি পৌঁছালো গ্রামের সব মানুষের কাছেই। টুসু ও শুনলো, রাজমহিষীর দুরারোগ্য ব্যাধির কথা এবং তারা যে দুটি বস্তু সন্ধান করছে তার কথা। সুঁচু তার বাগানেই একটি ছোট্ট জলাধারে ফুটিয়েছিল পদ্ম আর বোতলের পাকিয়েছিল সেই আম। টুসু তার বাবাকে অনুরোধ করলো তার বাগানের এই দুটি বস্তু নবাবকে দিতে যাতে রাজমহিষীকে বাঁচিয়ে তোলা যায়। টুসুর কথায় তার বাবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদশাহর লোকেদের বস্তু দুটি দিলেন। নবাব বস্তুটি পেয়ে রাজমহিষীকে ওষুধ করে তা খাওয়ালেন এবং রাজমহিষী সে ওষুধ খেয়ে সম্পূর্ণ সেরে উঠলো। নবাব অত্যন্ত খুশি হয়ে প্রচুর উপঢৌকন পাঠালেন টুসুকে। কিন্তু টুসু নবাবের কোন উপঢৌকন গ্রহণ করতে রাজি হলো না। এইদিকে বাদশাহর দূত টুসুর অসামান্য রূপ ও গুণের কথা গিয়ে নবাবকে সব খুলে বললে বাদশাহো টুসুকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। কিভাবে টুসুকে লাভ করা যায় তার উপায় খুঁজতে লাগলেন। এদিকে কুড়মিদের কাছে নবাবের এই অভিসন্ধির কথা পৌঁছে গেলে তারা ভয়ে কাতর হয়ে পড়লেন। অত অতঃপর একদিন রাতের অন্ধকারে টুসুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে পরদিন সকালে তারা পৌঁছে গেলেন এক সাঁওতাল গ্রামে। সাঁওতালদের চলছিল পাঁতা পূজা। এদিকে নবাবের সৈন্যবাহিনী, লোক লস্কর টুসুকে ধাওয়া করে পেছনে পেছনে আসছিল। কুড়মিরা হলো সাঁওতালদের বড় ভাই। তাই তারা শত শত সাঁওতাল সমাজের সমাবেশের ভিড়ে মিশে গেল। সাঁওতালরা পাঁতা পূজায় প্রচুর শূকর বলি দেয়। আর এই বলির পরে পরস্পর হাত ধরাধরি করে গোলাকার হয়ে নৃত্য করতে লাগলো। টুসুরাও সেই নাচে অংশগ্রহণ করল। কুড়মিরা সাঁওতালদের কাছে সব বিষয়টি খুলে প্রকাশ করলে সাঁওতালরা তাদের কথা দিল তাদের কোন বিপদ হবে না। নাচ গান শেষে সকলেই ভাত খাওয়া দাওয়া করল। ওদিকে নবাবের সৈন্য সামন্ত এসে তাদের আক্রমণ করল। সাঁওতাল তীরন্দাজরা তীরে

শুকরের মাংস গেঁথে তাদের দিকে ছুড়তে লাগল। মুসলমানদের কাছে শুকরের মাংস হলো নিষিদ্ধ এবং হারাম। তারা তোউবা তোউবা করে পিছু হটে পালিয়ে গেল। এই ঘটনার পর টুসুর মনে এক বিশেষ দুঃশ্চিন্তা দেখা দেয় সে বুঝতে পারে নবাব যখন একবার তার রূপে মুগ্ধ হয়ে পিছু ধাওয়া করেছে তা সে সহজে ছেড়ে দেবে না। টুসুর বাবাও টুসুর দুঃশ্চিন্তার কারণ বুঝতে পারলেন। তাই আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি টুসুর বিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু টুসু বিয়ে করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল। কারণ যদি সে বিয়ে করে তাহলেও তাদের মুক্তি থাকবে না। নবাব তাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে নিশ্চয়। এইভাবে নানা দিক বিবেচনা করে টুসু তার জীবন আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। একদিন তাই ঘটল। খুব ভোরে টুসু কাঁসাই নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মত্মহত্যা করল। নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য এই আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটেছিল পৌষ সংক্রান্তি মকরের দিনে। এই বিশেষ ঘটনাটিকে স্মরণে রাখতেই তথা টুসুর আত্মত্যাগের স্মরণে সেদিন থেকেই এই অঞ্চলের কাসাই, শিলাই, সুবর্ণরেখা আদি সকল নদীর তীরে তীরে আয়োজিত হয়ে আসছে টুসুর ভাসান ও মেলা।

লক্ষ্য করার বিষয় দুটি ঘটনার মধ্যেই মূল Motive বা ভাবগত মিল রয়েছে। সম্ভবত এই সকল কিম্বদন্তি বা কল্প কাহিনী সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই টুসু উৎসবে টুসুকে মেয়ে ও মায়ের রূপকটির প্রাধান্য পেয়েছে। জাওয়া-করম উৎসবেও মেয়েরা হলো করমতি বা জাওয়ার মাঞ আর টুসু পরবের ব্রত চারিনীরা টুসুর মাঞ। ভাবনাটিকে আরও একটু তলিয়ে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় তারা মা বৈকি। কারণ এই মেয়েরাই কোন একদিন জন্ম দিয়েছিল জাওয়ার আর তাদের রোপনের ফলেই তো সেই ধান শিসটির সৃষ্টি। যেটি তারা টুসুর সরাতে তুষ গোবরের সঙ্গে রেখে পূজা করে এক মাস। আসলে একটি এমন মহত্ত্বপূর্ণ কৃষি উৎসব ক্রমশঃ লোকায়ত জন মানসে তার স্বরূপটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। হারিয়ে ফেলেছে তার মূল তাৎপর্য। বিকৃত হয় ইতিহাসও। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই এই ঘটনাটি হতে পারে। লোক বিশ্বাস, সংস্কার, নেগ-নেগাচার, কাহিনী কিংবদন্তি সব ক্ষেত্রেই। প্রকৃত কৃষি সংস্কার, সংস্কৃতি ও তার ঐতিহ্যটিকে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। তাহলেই এই প্রক্ষিপ্ত বিষয় ও ঘটনা গুলিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারব।

টুসু উৎসবের নেগ নেগাচারঃ

টুসু বা মকর পরব হলো কৃষি বর্ষে শেষ কৃষি উৎসব। আখান থেকে যার শুরু হয় মকরে তার সমাপ্তি ঘটে। তবে নানা কারণেই টুসু বা মকর পরবের বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ পুরো একমাস ব্যাপী অনুষ্ঠান আর কোন উৎসবে নাই। অগ্রহায়ণ সাঁকরাইত বা সংক্রান্তিতে যার সূচনা তার শেষ মকরে পৌষ সংক্রান্তিতে। টুসু পাতা বা প্রতিষ্ঠা হয় অগ্রহায়ন মাসের সংক্রান্তিতে আর তার ভাসান হয় মকর দিনে বা পৌষ সংক্রান্তির দিনে। এটিও একটি পুরোপুরি কৃষি উৎসব মানে একটি ধান শিসকে টুসু বলে প্রতিষ্ঠা করে এক মাস ধরে তার পূজা আরাধনা করা হয় এবং মকর দিনে নদী বা পুকুরের জলাশয়ে তার বিসর্জন দেওয়া হয়। গীতে বলা হয়-

গীত

"জলে হেল জলে খেল জলে তুমার কি আছে
আপনার মনকে শুধাঞ দেখ জলে শশুর ঘর আছে।"[৯]

চাষীর ক্ষেতের জলে যে হেলে খেলে বড় হয় তাকে তার শশুর বাড়ী অর্থাৎ জলেই তাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। এটিই টুসু উৎসবের মূল তাৎপর্য। টুসু তাই পুরোপুরি একটি কৃষি উৎসব। একটি ধান শিস হলো তার পূজ্য দেবী। ধনদেবী বৃহৎ অর্থে অবশ্যই ধনলক্ষীও। কুড়মালি প্রবাদ ছড়ায় তাকে বলা হয়েছে-

"ক্ষেতে ধানি

খেরইয়ে ডিনি বা ডেনি
ঘর ভিতর ডিমনি
আর অঞে টুসু মনি।।"[১০]

অর্থাৎ যে বা যাকে আমরা ক্ষেতে থাকলে ধানি বা ধান বলছি, সেই হচ্ছে ডেনি বা ডিনি মাঞ দেবী। আর ঐ ডিনি মাঞই হলো ঘরের ভিতরে ডিমনি। ঐ ধানি, তিনি বা ডিমনিই হলো টুসুমনি। তাই লোক ছড়া বা প্রবাদে পরিষ্কার ভাবেই বলা হয়েছে ঐ ধান বা ধান শিসটিই হলো টুসুমনি বা টুসু উৎসবের মূল আরাধ্যা দেবী। পন্ডিতগণ তুষ, তোষলা থেকে যে নানা তত্ত্ব হাতড়ে বেড়িয়েছেন তা হলো পুরোটাই বিভ্রান্তিমূলক।
টুসু উৎসব পুরো একমাস জুড়ে ব্যাপ্ত। এরপর আমরা দেখে নেব উৎসবটির নেগ-আচার ও অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব গুলির পরিচয়-

ক। টুসু পাতা বা টুসু থাপনাঃ

এই যে একমাস জুড়ে টুসু উৎসব তার প্রথম দিন হলো অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি। এই দিনেই টুসু প্রতিষ্ঠা বা পাতা হয়। এই দিনটি তাই বলে 'ছুটু মকর'। পূর্বেই বলেছি টুসু পরব হলো পুরোপুরি নারীদের উৎসব। টুসু পাতা বা থাপনার কাজটিও তাই তারাই করে। তারাই টুসুর মা। সাধারণত পুরো অগ্রহায়ন মাস জুড়ে এই অঞ্চলে ধান কাটার কাজ চলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। মানুষ ক্ষেতে গঠে কাজের মাঝেই টুসু পরবের আগমনী গীত গাইতে থাকে।

১. আইসছে মকর দুদিন সবুর কর, তরা বাঁকা পিঠার জগাড় কর।
২. পৌষ পরবে যাবই বাপের ঘর, অ-তুই বিহা কর আর সাঁঘা কর।
৩. আসছে মকর দুদিন সবুর কর, তরা শায়া শাড়ি জগাড় কর।
৪. আসছে টুসু পৌষের একদিনে, টুসু ধনকে রাখবে যতনে।
৫. মকর, মকর, মকর পরবে তদের পা পড়ে না গরবে।
৬. বার মাসে তের পরব, চলে গেল গোপনে টুসু মায়ের পূজা আমরা করব অতি যতনে।

অগ্রহায়ন সংক্রান্তির দিন ধান কাটা, খামার খলাতে তা গাদা করে বসানো এবং আনুষঙ্গিক সকল কাজ সমাধান করার নিয়ম। কারণ এই দিন ক্ষেত থেকে ডেনি ঠাকরানকে যেমন খামারে আনার নিয়ম তেমনি এই দিনেই সন্ধ্যা নেমে এলেই বাড়ীতে চলে টুসু পাতার কাজ। ডেনি ঠাকুরান বাড়ীতে আসবেন এবং টুসু পাতার দিনটি তাই অতি শুভ ও পবিত্র একটি দিন। এইজন্য ভোর থেকেই ঘর-দুয়ার গোবর মাটি দিয়ে লিপা লরা এবং বাড়ীঘর পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়ে যায়। গৃহকর্তা সারাদিন ক্ষেতে খামারের কাজে ব্যস্ত থাকলেও বিকাল হলে বা সন্ধ্যা নামার আগে ক্ষেত থেকে ডেনি বা ডিনি মাঞ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় করে এনে খামারে প্রতিষ্ঠা করে। বেলা ডোবার পর শুরু হয় টুসু পাতার কাজ। মেয়ে দুটি মাটির তৈরী সরাকে গুড়ি দিয়ে গাবানো হয়। খামার থেকে আঙ্গিনা এবং টুসু পাতার স্থান পর্যন্ত আলপনা আঁকা হয়। মেয়েরা দিনের বেলায় বিভিন্ন ধরনের ফুল জোগাড় করে। বিশেষ করে বাঁদু ও গেঁদা ফুল টুসুর জন্য অবশ্যই লাগবে। সাধারণত টুসুকে পাতা হয় কোন ঘর বা ঘরের চালিতে থাকা কুলুঙ্গিতে। মাটির সরা দুটিতে তিনটি বা পাঁচটি গোবর নাড়ু ডেনি মাঞ এর থেকে নেওয়া ধান শিস, কিছু তুষ বা ভুঁসা, প্রদীপ, ধুপ ধুনা ফুল দিয়ে কুলুঙ্গিতে সরা দুটি স্থাপন করতে হয়। কুলুঙ্গিতে স্থাপন করে সকল মেয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম নিবেদন করে। একটি পরিবার এককভাবে টুসুপাতে অথবা পাশাপাশি ঘরের সকলে মিলেও কোন এক জায়গাতে টুসু স্থাপনা করে থাকে। এরপর সকল মেয়ে সমবেত কণ্ঠে টুসুর গীত পরিবেশন করে। গীতই হলো মূলত টুসু পূজার মূল উপাচার। যদিও কমপক্ষে ১টি ফুল টুসুমনিকে দিতে হয়। আর সাতদিন পর পর লাগে আট কলইয়া।

আট কলইয়া হলো আট প্রকার কলাই বা ডাল শস্যের ভাজা দানা নিবেদন। এটাকে ভোগ বলা যেতে পারে। যাই হোক টুসু পাতার পর শুরু হয় টুসু গীতের বন্যা।

"১। খামার ভরা সনার ধানে
টুসু পাইতব যতনে
আই গো তোরা সঁগি জুড়ি
টুসু পাতি এক মনে।।
২। আঘন মাসের শেষে টুসু
আলে সাঁকরাইতের দিনে।
টুসু ধনকে রাইখব আমরা
আদরে আর যতনে।।"[১১]

টুসু পাতার পর এই ভাবে এক মাস ধরে চলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় টুসু পূজা ও আরাধনা। তবে মূলত তা গানে গানে। আনুষ্ঠানিক কোন পূজার আয়োজন থাকে না। প্রত্যেক বাড়ীর মেয়েরাই একটি করে ফুল সংগ্রহ করে টুসুর জন্য নিয়ে আসে। কুমারী মেয়েরা বা কখনো কখনো সদ্য বিবাহিতা বউ এরাও নানা মনস্কামনা পূরণে মানসিকও করে থাকে টুসুর কাছে। তবে সেই সব মানসিকে টুসুকে অন্যান্য দেব-দেবীর মতো পাঠা-ভেড়া বা হাঁস মুরগি লাগেনা। টুসু যে প্রকৃতই একটি প্রকৃতির দেবী বা দেবীর মধ্যে মানবিক ভাবনা যে নাই এটি তার একটি বড় প্রমাণ। মানুষকে দেবতা সৃষ্টি করেছে কিনা তা আমাদের জানা নাই; কিন্তু দেবতাকে যে মানুষ তার মনের মাধুরী দিয়ে নিজের মতো করে কল্পনার তুলিতে অঙ্কন করে নেই এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। টুসু পাতার কালে টুসুদেবী, আরাধ্যা, পূজা অবশ্যই কিন্তু তারপর ক্রমশঃ তার মধ্যে আরোপিত হয় সে কেবল মেয়ে অথবা মা। ছোট ছোট মেয়েরা কল্পনা করে মাতৃ স্বরূপে তার বয়স্ক মহিলাদের কাছে সে কেবলই একটি আদরের ছোট্ট মেয়ে। মেয়েদের মনে যে কামনা, বাসনা, আকাঙ্খা থাকে তারই সুন্দর বিমূর্ত রূপ বহিঃপ্রকাশ ঘটে গীতে।

গীত

"টুসু হামরা থাপনা করি, অঘন সাঁকরাইত দিনে গো
অবলা বাছুরের গোবর, লগন চালের গুড়ি গো।
লউতন পেতিলাই রাখি, চুনি চুলা গোবর চুলা গো
তার উপরে ডিনি মাঁই, গেঁদা ফুলের হালা গো।
লিহ লিহ লিহ টুসু, নানা বরণ ফুল গো
সব দিন যে দিব মাঁই গো, সারই, বাঁদু ফুলা গো।
সকাল সাঁঝে দিব মাইগো, ধুপ ধুনা বাতি গো
সঁগি সভে গীত গাঁহে, তর মন ভুলাব গো।
চলল সঁগতি সভে, টুসু গীতে রিঝাব গো
টুসু মাঞের আশীষ নিয়ে, সংসারে ঘর বইসাব গো।"[১২]

মেয়েরা সকলে সমবেত হওয়ার পর টুসুকে জাগরণ গীত দিয়ে জাগায় আবার যখন বাড়ি ফিরে যায় তখন ঘুম পাড়ানি গীত গেয়ে তাকে একটি শিশু কন্যাকে যেমন ঘুম পাড়ানি গীত মা গায় এক্ষেত্রেও তাই ঘটে।

গীত

"উঠ উঠ উঠ টুসু, তুমায় উঠ করাতে আস্যেছি
আমরা যে সব সঁগি জুড়ি, তুমার পূজায় বস্যেছি।
টুসু পূজার খনে
সনঝা দেবী বন্দী গো, মনে মনে।।"[১৩]

সন্ধ্যা পেরিয়ে অন্ধকার গাঢ় হতে থাকলে মেয়েরা আপন আপন বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। তারা নিজেরা যেমন ঘুমাবে তেমনি টুসুমনিকেও ঘুমাবার জন্য আবাহন করে।

গীত

"ঘুমাও ঘুমাও ঘুমাও টুসু,
রাইত হল্য অনেক ভারি,
গেঁদা ফুলের মালা নিয়ে,
কইরব না কাল আর দেরি।।
রং:- টুসু ডাক মা বলে
হামরা রা দিব বদন ভরে।
হামরা চুমু খাব বাদন ভরে।।"[১৪]

পৌষ মাসের শেষ চার দিন উৎসবের শেষ দিন গুলি হলো-আউড়ি, চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর এবং আখান। তবে মূল উৎসবের আয়োজনের পূর্বেই মেয়েরা সকলে মিলে আয়োজন করে পৌষালু বা বনভূজা। গ্রামের পাশাপাশি কোন জঙ্গল অথবা ডুংরি এবং নদীর মনোরম জায়গা দেখে এই বনভূজার আয়োজন করা হয়। মাছ, মাংস সহ ভাল ভাল খাবারের আয়োজন করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের হলেও সকলে পরস্পর বোন বোনের মতো ভালোবাসা, মমতা, সহৃদয়তা জড়িয়ে পড়ে। সখ্যতা ও প্রেমের অদ্ভুত বন্ধন তৈরী হয় টুসু পাতা ও বনভূজা আদি আচার অনুষ্ঠান গুলির ফলে। সারাদিন প্রকৃতির কোলে খাওয়া-দাওয়া, গীত-নাচের পর সন্ধ্যায় ফিরে এসে আবার শুরু হয় টুসু পূজা ও গীত। টুসু উৎসবের শেষ পর্যায়ে হলো উৎসবের মূল পর্ব আর এই দিনগুলিকে বলা হয় আউড়ি, বাঁউড়ি, মকর এবং আখান। পৌষ মাসের শেষ চার দিন হলো আউড়ি, চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর এবং আর নববর্ষের প্রথম দিনটি হলো আখান। উৎসবটিকে কেউ কেউ ফসল তোলার উৎসব আবার কেউ কেউ বলেন নববর্ষের উৎসব। হ্যাঁ তা বলা যায় বৈকি? প্রথম চার দিনকে আমরা বিগত বর্ষের বর্ষ সমাপন উদযাপন এবং আখানকে বর্ষবরণ উৎসব বলা যেতেই পারে। জানা যায় মিশর দেশেও অনুরূপ বর্ষ সমাপন উদযাপন রীতির প্রচলন ছিল। বৎসরের শেষ পাঁচ দিন তাঁর আনন্দ উৎসব এবং খাওয়া-দাওয়া করে উদযাপন করত। বিষয়টি অবশ্যই বিস্ময়কর। ভারতীয় কৃষি সভ্যতার উৎসব ও রীতিনীতি এবং কৃষি ক্যালেন্ডার মিশরে কিভাবে গেল তা গভীর গবেষণার প্রয়োজন। সূর্য পূজা মিশরেও ছিল, ভারতের কৃষি সভ্যতার মানুষেরও রয়েছে। মকর শব্দটির অর্থও হয় সূর্য। তাই বলা যায় মকর উৎসব হলো সূর্য দেবতার স্মরণ মনন পূজার উৎসব। আঁউড়ি, চাঁউড়ি, বাঁউড়ি শব্দগুলি এবং ঐদিন গুলির আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নানা তাৎপর্য গুলি আমরা আলোচনা করব।

আঁউড়িঃ- টুসু উৎসবের মূল পর্বের প্রথম দিনটি হলো আঁউড়ি। আঁউড়ি শব্দটি অবশ্যই কুড়মালি ভাষার কিন্তু গবেষকগণ শব্দটির বিষয়ে তেমন কিছুই উচ্চবাচ্য করেননি। কুড়মালি ভাষাতে আঁউড়ি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তা জানা না গেলেও 'আউড়ান' বলে একটি শব্দ রয়েছে যার অর্থ হলো সূচনা বা শুরু। কিন্তু প্রশ্নটি হলো কিসের সূচনা বা শুরু? উৎসবের নাকি মকর বা সূর্যের উত্তরায়ন যাত্রার। কারণ নামকরণ গুলি কেবল মাত্র পরব বা আনন্দ উৎসবকে ঘিরেই সৃষ্টি হয়নি। এর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির মানুষের নানা জ্ঞান, সিদ্ধান্ত এবং বৈজ্ঞানিক সত্য। তাই আমার মনে হয় সূর্যের সেই উত্তরায়ন যাত্রার আউড়ান বা আয়োজনের শুভ সূচনার ইঙ্গিত শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। যাই হোক ঘরে ঘরে যখন টুসু উৎসবের প্রস্তুতি চলতে থাকে সেই কাজ গুলি হলো ১) খামার নিমটা ২) চালধোয়া ৩) তিল ধোয়া ৪) চাল ভেজা ইত্যাদি।

১) খামার নিমটাটি হলো চাষী পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সারা বছরের ফসল খামারে যা তোলা হয়েছে তার ঝাড়াই মাড়াই শেষ করতে হয়। আগড়া থসড়া গুটানো, পাঁখি পুয়াল গুছানো, আঁউড়ি পুয়াল কে গাদা করে বসানো এর মধ্যে অন্যতম কাজ। নিমতা শব্দটি ও কুড়মালি ভাষার যার অর্থ শেষ করা বা সমাপন করা। এই দিনটিতে এই সকল কাজ সমাধান করা বাধ্যতা মূলক। তা না হলে উৎসবের আনন্দও থাকেনা কারণ চাষীর চিন্তা যদি খামারের কাজের দিকে থাকে তাহলে তা বাধা প্রাপ্ত হবে।

২) চাল ধোয়া কাজটিও চাষী পরিবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করে। কারণ কৃষি উৎসবগুলির প্রতিটি উৎসবের আয়োজনের অন্যতম কাজ হলো পিঠার আয়োজন। পিঠা না হলে পরব বা উৎসব বলে মনে করাই হয় না। আবার পিঠারও রয়েছে নানা প্রকারভেদ। বিশেষ করে টুসু বা মকর পরবের পিঠা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই পিঠার নাম উধি পিঠা, গড়গইড়া পিঠা, ডুবু পিঠা এবং পোষ পিঠা। এই বিধার মূল উপাদান চালের গুঁড়ি হলেও তাতে পুর হিসেবে ভিতরে থাকে তিল, আলু, নারকেল, চিনি বা বিশেষ কোন বস্তু। গরম জলের ভাপ বা বাস্প দিয়ে সিদ্ধ করে তা তৈরী করা হয়। পিঠের আকার আকৃতিতে নানা ফুল ফল বা জিনিসের ঢং এ তৈরী করা হয়। আর এই পিঠার প্রস্তুতির প্রথম কাজটি হলো চাল ধোয়া। চাল ধোয়া অর্থে চালের মধ্যে থাকা কাঁকর, মাটি, পাথর, আগড়া থসড়াকে ভালো করে বেছে চালকে বাছাই করা। কারণ ঐ সব্য আবর্জনার সামান্যতম থাকলেও তা পিঠা খাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। ক্ষতিকারক ও বটে। তাই সমস্ত চাল ভালো করে বেঁছে বাঁধ বা পুকুর থেকে ধুইয়ে আনতে হয়। এই কাজটি হলো চাল ধোয়া।

৩) তিল ধোয়া:- পূর্বেই বলেছি উধি পিঠা তৈরীর জন্য মশলা বা পুরের দরকার হয়। আসলে উধি পিঠার তৈরীর মধ্যেই রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। আর এই স্বাতন্ত্র্য বিশেষ প্রকার পদ্ধতিতে গরম জলের বাষ্প দ্বারা সিদ্ধ করা আর পিঠের ভিতর নানা রকমের পুর দেওয়া। এই অঞ্চলে যেটি প্রধান পুর হিসেবে প্রচলিত বা জনপ্রিয় তা হলো তিল। তিল হলো চাষেরই একটি তৈল বীজ। তেল হিসেবেও তিল তেলের ব্যবহার রয়েছে আবার তিলকে নানাভাবে খাওয়াও যায়। কারণ তিল চোখের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী একটি খাদ্য। উধি পিঠায় তিলের ব্যবহারের পিছনে এটিও একটি কারণ হতে পারে। যাই হোক চাল ধোঁয়ার মতোই মেয়েরা পুকুরে গিয়ে তিলের খোসা ছাড়িয়ে তাকে ভালো করে ধৌত করে এবং রৌদ্রে তারপর ভালো করে শুকনো করা হয়। তারপর পিঠেতে তা ব্যবহার করা হয়।

চাল ভেজা:- টুসু পরবের আনন্দ অনুষ্ঠানের সঙ্গে খাবারের আয়োজনটি একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে পড়ে। বাড়িতে বাড়িতে উধি পিঠা তো হয়েই এর সঙ্গে মাংস পিঠা, সিম পিঠা, সহ নানা ধরনের পিঠার ও আয়োজন করা হয়। পাঁচ দিন উৎসবের প্রতিদিনই এ আয়োজন হয়ে থাকে। এর জন্য প্রয়োজন হয় অনেক পরিমাণ চাল গুঁড়ির। তাই পরিবারের মেয়েরা চাঁউড়ির দিন থেকেই চাল ভেজানোর কাজটিও শুরু করে। আর এই

পরবে মেয়েদের প্রধান কাজটি হয় পিঠে করা। আঁউড়ির দিনটি বলতে গেলে উৎসবের প্রথম দিন। তাই সেদিন থেকেই টুসুর কাজে আরও বেশিক্ষণ ধরে চলে গীতের আয়োজন। টুসু উৎসব আর সেই উৎসবকে ঘিরে মেয়েদের নানা আশা-আকাঙ্খা কিভাবে তাদের হাসায় কাঁদায় তার বিচিত্র কথা পাওয়া যায় টুসু গানে।

"১। এত বড় পোষ পরবে
রাখলি মা পরের ঘরে
পরের মা কি বেদন জানে
জ্বালা দেয় আমার প্রাণে।
রং।।
বল মা আমার মন কেমন করে
যেমন শেলি মাছে উফাল মারে।।
১। সোব সঁগতি পরান গতি
রইল মা একা ঘরে
যখন আমার মা কাঁদিবে
বধাবে সবাই মিলে।।"[১৫]

চাঁউড়ি:- চাঁউড়ি হলো মূল উৎসবের দ্বিতীয় দিন। উৎসব যত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে থাকে ততই উত্তেজনা। কাজের চাপ ও বাড়তে থাকে। বিশেষ করে চাষী ঘরের মেয়েদের খাবার সময় থাকেনা। তবে এই দিনের প্রধান নেগা-চারের কর্ম গুলি হলো (১) তিল ছুলা (২) গুঁড়ি কুঠা (৩) মেয়েকে শ্বশুর ঘর থেকে বাড়ীতে নিয়ে আসা।

১) তিলছুলা:- আঁউড়ির দিনে তিল ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকোনোর পর উপরের যে কালো অংশ থাকে তাকে ছুলে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। এই দিন এই কাজটি করা হয়। কালো অংশটি ছুলে বাদ না দিলে পিঠের স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই কাজটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আজকের দিনে এই কাজগুলির দিনের অনেক সময় পরিবর্তন হয় কিন্তু চাঁউড়ির দিনের মধ্যেই তা করতেই হয়।

২) গুঁড়ি কুটা:- আগেই বলেছি পরের পাঁচ দিনের প্রতিদিন নানা খাবার দাবারের আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে পিঠা থাকে বাধ্যতামূলক। আর পিঠার জন্য অনেক চাল গুঁড়ির প্রয়োজন হয়। তাই গুঁড়ি কুটার কাজটি শেষ করা হয় চাঁউড়ির দিনেই। এরপর নানা ধরনের পিঠে তৈরী করা হয়।

৩) মেয়েদের শ্বশুর ঘর থেকে আনা:- এই অঞ্চলের সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ সামাজিক রীতি হলো পরব-তিহারে মেয়েকে বাপের বাড়ীতে নিয়ে আসা। বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি না ঘটলেও নতুন বিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি ১০০% সত্য যদি বাপ-মা মেয়েকে না আনে তবে মেয়ে ভাবে বাপ-মা তাকে আর সে ভাবে ভালবাসে না বা বিয়ে দিয়ে তারা নিজের দায় সেরেছে। মাতৃভূমি ও মা-বাবার প্রতি মেয়ের টানে মেয়েরা বাপের বাড়ী আসার জন্য উৎসবের বহু আগে থেকেই উৎসুক হয়ে থাকে। তাই বাপ-মা শেষ পর্যন্ত চাঁউড়ি দিনে মেয়েকে বাড়িতে আনবেই। কারণ তারপরের দিন হলো বাঁউড়ি বা টুসু জাগরণের দিন। সেখানে তাকে ভাগ নিতে হবে। আমি জানি ছোট বেলার সঙ্গী সাথীদের সাথেও মিলন ঘটবে। শশুর বাড়ির নানা কষ্টের লাগব হবে উৎসবের আনন্দে। তাই উৎসব গুলিতে সমাজের নানা রীতি নীতি এর নানা তাৎপর্য গুলিকে বুঝতে আমাদের সহায়তা করে। সে কথা প্রতিধ্বনিত হয় টুসু গানে।

"(১) আমার টুসু সাধের বিটিগো
অন্য লকে কি জানে?
কারু কথা কারু ব্যথা
কারউ লাগে নয়নে।।
রং।। কুলহির কদম তলে
টুসু আমার ডাল ভাঙে খেলা করে।।"[১৬]

চাঁউড়ি শব্দটির অর্থ নিয়ে কোন গবেষকেই কোন উচ্চবাচ্য করেননি। কুড়মালি ভাষাতেও এর অর্থ হয় কিনা, অন্তত পক্ষে আমার জানা নেই। তবে 'চঁউরা' শব্দটি কুড়মালি ভাষাতে রয়েছে। উৎসবটিকে যদি মকর পরব বলি অর্থাৎ উৎসবটিকে সূর্য বন্দনার উৎসব বলে যদি স্বীকার করি তাহলে 'চঁউরা' শব্দটি থেকে এর একটি অর্থ হতে পারে। চঁউরা শব্দটি থেকেও চাঁউরা বা চাঁউরি এবং চাঁউড়ি শব্দ আসতে পারে। যার অর্থ করা যায় সূর্যের ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তন। আসলে এই ব্যাখ্যা গুলির সব গুলিই হচ্ছে আমাদের নিজস্ব মতামত। এ অঞ্চলের কৃষি উৎসবগুলির বিষয়ে চর্চা, গবেষণা সেভাবে আজও হয়নি। তাই আমাদের কাছে আজও কোন রেডিমেড ডেফিনেশন বা শব্দ তাৎপর্য নাই। তবে কৃষি উৎসব গুলির মূল দৃষ্টিকোণ, তথা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দর্শন থেকে শব্দগুলির এভাবে ব্যাখ্যা সম্ভব।

বাঁউড়ি:- টুসু উৎসবের পাঁচটি দিনের মধ্যে বাঁউড়ি দিনটির মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তাই এদিনের আচার-অনুষ্ঠান নেগ-যোগ, আজি আয়োজনও অনেক বেশি। এই দিনেই টুসুর জাগরণ তাই সকাল থেকেই মেয়েদের সাজ সাজ ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। সকাল থেকে ঘরদোর আঙিনা গোবর দিয়ে লিপা-লরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো বটেই এই দিনেই পিঠার বিশেষ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এমনকি বাড়ীতে ভাত রান্নারও রীতি নাই। সকলেই পিঠা, মুড়ি, চিড়া ও নানা খাবার খেয়েই বাঁউড়ি উদযাপন করে। এই দিনের মূল মূল নেগ-নেগাচার গুলি হলো (১) মাছ দেখা (২) ঘরদোর পরিষ্কার (৩) বাঁউড়ি সিনান (৪) বাঁউড়ি পিঠা (৫) বাঁউড়ি বাঁধা (৬) টুসু জাগরণ (৭) মালা বদল (৮) তল পা তল হাতে সরিছা তেল নেওয়া।

১। মাছ দেখা:- মাছ শুভ ও যাত্রার প্রতীক বলে এই অঞ্চলের মানুষ মনে করে। তাই প্রতিটি বাড়ীতে প্রতিটি মানুষ এই দিনটিতে মাছ দর্শণ করে। ঘুম থেকে উঠেই এই কাজটি করতে হয়। তাহলে তা সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করা হয়। হয় পূর্ব দিন না হয় ঐ দিন জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ বাড়ীতে বাড়ীতে মাছ পৌঁছে দিয়ে আসে। এটি তাদের বাৎসরিক কর্ম বলে তারা মনে করে। সাধারণত চ্যাং মাছ তারা দেয়। এবং প্রতিটি বাড়ী থেকেই পাওনা আদায় করে। মাছ দেখে কোথাও গেলে যেমন যাত্রা শুভ হয় তেমনি নববর্ষের পূর্বে এই মাছ দেখা পুরো বৎসর শুভ যাবে বলে মানুষের বিশ্বাস।

২। বাঁউড়ি সিনান:- প্রতিটি বাড়ীর মেয়েরা ভোর থেকে ঘরদোর গোবর দিয়ে নিকানো থেকে শুরু করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পর স্নান করার জন্য পুকুরে চলে যায় সকাল সকাল। একে বলা হয় বাঁউড়ি সিনান।

৩। বাঁউড়ি পিঠা:- বাঁউড়ি দিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো বাঁউড়ি পিঠার আয়োজন। মেয়েরা বাঁউড়ি সিনান করার পর সকলে মিলে উঁধিপিঠা কেউ বা মাংস পিঠা করার জন্য বসে যায়। উঁধি পিঠা তৈরীর পদ্ধতিটিও বিচিত্র। প্রথমে একটি বড় হাঁড়ি নেওয়া হয়। হাঁড়িটিকে জল ভর্তি করে উনুনের উপর বসানো হয়। জল গরম ও ফুটতে থাকলে হাঁড়িটির মুখে অন্য একটি ছোট ছিদ্র যুক্ত মাটির ছোট হাঁড়ি বসানো হয়। এই হাঁড়ির ভিতরেই দেওয়া হয় গুঁড়ির তৈরী কাঁচা পিঠা গুলি। মেয়েরা নানা আকার ও নানা আকৃতির পিঠা তৈরী করে, যার ভিতর দেওয়া থাকে তিল, ছাঁছি, গুড়, চিনি, নারকেল, সর আদি নানা বস্তু দিয়ে পুর। কাঁচা পিঠা গুলি

সিদ্ধ হয়ে গেলে পুরো হাঁড়ির পিঠা গুলি নামিয়ে রাখা হয়। এরপর আবার পিঠা ভর্তি করে মূল হাঁড়ির উপরে বসিয়ে দেওয়া হয়। একেই অঞ্চল ভেদে উঁধি পিঠা, পোষ পিঠা, ডুবু পিঠা এবং ভাপা পিঠাও বলা হয়ে থাকে। কোন গোষ্ঠীতে যদি কেউ মারা যায় তাহলে ঐ বৎসর সেই পুরা গোষ্ঠীতে পিঠা করে না বা করা নিষিদ্ধ।

(৪) বাঁউড়ি বাঁধা:- বাঁউড়ির দিনে বাঁউড়ি বাঁধা কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণা। এই কাজ করে ছেলেরা। ঐ বৎসরের চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ধান বীজ গুলি পৃথক পৃথক ভাবে কুঁচড়ি করে বেঁধে রাখা হয়। কেবল ধান বীজ নয় ঐ বৎসরের জন্য অনেকেই ধান থেকে চাল তৈরী করে তা কুঁচড়ি করে বেঁধে রাখে। একে বলে বাঁউড়ি বাঁধা। কুঁচড়ি ও ধানের গোলায় গুঁড়ি প্রলেপ বা চোক তৈরী করে তার উপর সিঁদুরের দাগ দেওয়া হয়। এই নেগাচার গুলির মধ্যে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যটি সহজেই প্রতীয়মান হয়।

(৫) টুসু জাগরন :- টুসু পূজা ও আরাধনার শেষ দিন হলো এই জাগরণ দিন। বাঁউড়ির দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে যায়, টুসু জাগরণের কাজ। মেয়েরা যেখানে টুসু পাতে তার চারিদিকে নানা ফুলের মালা দিয়ে সাজায়। রঙিন শাড়ি দিয়ে ঘিরে ডেকোরেশন তৈরী করে। চারিদিকে আলপনা এঁকে দিয়ে সাজায়। ধূপ, ধুনা, প্রদীপের আলোয় চারিদিক আলোকিত করে। বাজার থেকে অথবা হাট থেকে নিয়ে আসে চৌড়ন বা চৌডল। টুসু থাপনার পাশেই সেটি রাখা হয়। আগে মাইক ছিল না। এখন তো ডি.জে ব্যতিরেকে কোন জাগরনই হয় না। আয়োজন করা হয় চিড়া, গুড়, বাতাসা, বোঁন্দে, মিঠাই, মিষ্টি এবং লুচির ভোগ। কারণ সারা রাত্রি ব্যাপি পহরে পহরে তা দেওয়া হয়। আর আট কলইয়া বা আট প্রকার শস্যদানার ভাজা ভোগ তো থাকবেই। এছাড়া ডেকোরেশনের অভিনবত্ব হলো ফুটন্ত শালুক ফুলকে দড়ি টান দিয়ে চারিদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া। স্থানে স্থানে রঙিন কাগজের ফুল তৈরী করেও দেওয়া হয়। টুসুকে দেওয়া হয় গেঁদা ফুলের মালা। আর একটি অন্য মালা রাখা হয় গ্রামের অন্য মেয়েদের দলের সঙ্গে মালা বদল করার জন্য। রাত্রির খাবার পর সকল মেয়েরা টুসুর কাছে চলে আসে। কেউ বাদ যায় না। সারা রাত্রি যাপনের মত সাজগোজ করে আসে। পাশাপাশি আসন পেতে শুরু করে টুসুর গীত। এ কোন বই পুঁথিতে ছাপানো বা কারউ লিখে দেওয়া গীত নয়। মেয়েরা নিজেরাই মুখে মুখে রচনা করে গীতের ডালি। তৎক্ষণাৎ গীত রচনা করার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে মেয়েদের। আসলে তারা তো মা, তারাই তো জননী হতে পারে। সৃষ্টি ও সৃজনের ক্ষমতা তাদের সংসার গত। কোন কল্প কথা বা বিষয় নয় চিন্তা চেতনার বাস্তব অনুভূতির কথায় গানে গানে উঠে আসে। কৃত্রিমতার এখানে সুযোগ নাই। মায়ের ভাষায়, মুখের ভাষায় রচনা করে সেই গীত।

গীত

"রং:- কুলির ধুলা বাঁশ পাতের কুলা
আমরা খেলেছি ছুটুর বেলা।।
১। চাল ভাজা, কড়কড়্যা ভাজা
কুথি ভাজা রগড়ে
আমার টুসু চলে গেলে
কাঁদব আমি সগড়ে।।"[১৭]

এই ভাবে চলতে থাকে গীত রচনা। এমনকি কখনো কখনো মেয়েরা দুটি দলে বিভক্ত হয় ও চলে গীতের লড়াই। কবিগানের লড়াইয়ের মত। গান আর থামে না। এদিন রাত্রিতে ঘুমানো বারণ। কেউ ঘুমায়ও না। গ্রামের একদল মালা বদল করতে অন্য দলের আখড়াতে যায়। মালা বদল হয়। প্রীতি বিনিময় হয়। একে

অপরকে ভোগ খাইয়ে দেয়। তবে গীতের লড়াইও হতে পারে। পরস্পর নিন্দা অপবাদ ও গানের মাধ্যমে দেওয়ার রীতি রয়েছে। অপর দলও অন্য পক্ষকে ছাড়ে না। উত্তর দেয় তাদের মতন করেই।

"রং:-লেলেলে মালা বদল কর
আমরা আসেছি হেঁট কুলহির দল।
১। উপর কুলহি নাম কুলফি
টাঁগালি বনমালা
বনমালার ফুলে ফুলে
উড়ে বসে ভমরা।।"[১৮]

এভাবে মেয়েদের হইহুল্লোড়ে নাচে-গানে বাঁউড়ির জাগরণ রাত্রি অতিবাহিত হয়। সকালেই মকর। টুসুকে বিদায় জানাতে হবে। মেয়েরা বিষাদ মনে বাড়ি ফিরে এসে সেই টুসু ভাসানের প্রস্তুতি শুরু করে। বাঁউড়ির রাত্রির সমাপন ঘটে এই ভাবেই। কিন্তু বাঁউড়ি শব্দটি নিয়ে দ্বন্দ্ব ও জট কাটেনি আজও। শব্দটির অর্থ ও দিনটির তাৎপর্য নেগ-নেগাচার পর্যবেক্ষণ করে নানা প্রকারের মতামত দিয়ে থাকেন অনেকেই। এর মধ্যে একটি দিক হলো 'বাঁউড়ি বাঁধা'। কথাটির প্রচলন রয়েছে বেশ। বাঁউড়ি বাঁধা বলতে সকলেই বীজ ধান বা চালের পুড়া বা কুঁচড়ি বাধার যে কাজ হয় সেটিকেই বুঝে থাকেন। নিঃসন্দেহে সাধারণ দৃষ্টিতে এর সরল ব্যাখ্যা সেটিই হতে পারে। অন্য অর্থ আমাদের কাছে না থাকায় আজ এটিকেই মেনে নিতে হয়। কিন্তু একটি প্রাচীন কৃষি উৎসব ও তার বিজ্ঞান ভিত্তিক তাৎপর্যটিকে যদি বিচার করা হয় তাহলে আরও অন্য দিক উন্মোচিত হয়। বিশেষ করে আমরা যদি সূর্যের উত্তরায়ণ প্রসঙ্গটিকে যদি মেনেনি তাহলে বাঁউড়ি হয়ে যায় অন্য কিছু। কুড়মালি ভাষায় 'বাঁউ' বা 'বাঁউয়া' শব্দ রয়েছে। যার অর্থ বাম বা বাম দিক। আমার অনুমান বাঁউড়ি শব্দটি বাঁউয়া+মহড়ি শব্দের সংযোগে গঠিত। বাঁউয়া মহড়ি- বাঁউড়ি শব্দটির সৃষ্টি সম্ভব যার অর্থ করলে দাঁড়ায় বাম দিকে যাত্রা বা গতি। সূর্যের দক্ষিণায়নের শেষ বিন্দু হলো এই দিন। এর পর তার গতি হবে বাম দিকে। তাই দিনটি চিহ্নিত হয়েছে বাঁউড়ি নামও অনেকের মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসতেই পারে একটি লোক উৎসবকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই গভীর তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া কি বাস্তব সম্মত। আমাদের বিচারে তার উত্তর হ্যাঁ। বিষয়টি বিস্ময়ের হলেও অতি প্রাচীন কালেই মানুষ বিজ্ঞানের এই নিগূঢ় সত্যগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিল তা না হলে আখান থেকে রহিন এবং রহিন থেকে ঈদ এবং মকরে তার নির্দিষ্ট গতিপথ অবস্থানকে চিহ্নিত করে লোক উৎসব গুলির আয়োজন করল কিভাবে? বিষয়টি বিবাদ ঠিক কিন্তু ধারণা ও মতামতটিকে জড়িয়ে দিয়ে উৎসবগুলির তাৎপর্য কে আমরা খাটো বা একপেশে করতে পারি না।

মকর:- টুসু উৎসবের টুসু ভাসান বা শেষ পর্বটি হলো পৌষ সংক্রান্তি। আর এই দিনটিকে বলা হয় মকর। মকর শব্দটি প্রায় একটি সর্বভারতীয় শব্দ যা টুসু শব্দের নাই। মানুষের বিশ্বাস ও জ্যোতিষ মতে সূর্য এই দিন মকর রাশিতে অবস্থান করে এবং তারপর তার উত্তরায়ন যাত্রা শুরু হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান মতে বিষয়টি তাই ঠিক কিন্তু লোকসংস্কৃতি গবেষকগণ লোক সংস্কৃতির সঙ্গে বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিজ্ঞান কে জুড়তে কখনোই রাজি নন। তাই এই উৎসব গুলি ব্যাখ্যা মেনে আসে চূড়ান্ত বিভ্রান্তি এবং তার বিকৃতি। ইঁদ থেকে ইন্দ্রধ্বজের পূজা, বাঁদনা থেকে "বন্দনা" বা 'বাঁধনা' বিকৃতি এই ভাবেই এসেছে মনে করে অন্তত পক্ষে বিজ্ঞানের সূর্যের গতি ও অবস্থানটির কথা বলা হয়ে থাকে। আমাদের কাছে এটিই হলো শেষ সত্য। যাই হোক এই বিশেষ দিনের এবং উৎসবটির শেষ পর্বের নেগ-নেগাচার গুলি হলো- ১) মকর স্নান ২) টুসু ভাসান ৩) বেজা বিঁধা ৪) ফোদি খেলা।

(১) মকর স্নান:- মকর দিনের সবচেয়ে প্রাথমিক ও শুভ কাজটি হলো মকর স্নান। এই স্নান পর্বটি কেবল আর মেয়েদের থাকে না। বালক বৃদ্ধ জাতি সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষ খুব ভোর থেকে মকর স্নান করে। তার বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয় বিষয় এই স্নানের রীতি বা স্নান উৎসবটি প্রায় সর্বভারতীয় একটি রীতি। এই দিনটিকে পবিত্র মানা হয় এবং স্নান উৎসব সর্বত্র উদযাপিত হয়। আমাদের ভেবে দেখা উচিত টুসু উৎসবের এই বিশেষ দিনটি কিভাবে সর্বভারতীয় হয়ে গেল। এছাড়াও পূর্বেই বলেছি প্রাগ ঐতিহাসিক কালে সিন্ধু সভ্যতাতেও এই স্নান উৎসব ছিল সে কথা বলেছেন বিশিষ্ট মানববিজ্ঞানী G.L. Possehl. যাই হোক মেয়েরাও সকাল সকাল ঘরের প্রাথমিক কাজকর্ম সেরে টুসুকে নিয়ে শুরু করে শোভাযাত্রা। যা ভাসান শোভাযাত্রা। আবার সকলে এক জায়গায় সমবেত হয়ে ধান শিস সহ মাটির সরা দুটিকে চৌড়লের ভিতরে স্থাপন করে। তারপর চৌড়লটিকে দু-হাতে ধরে উপরে তুলে নেয়। আজকাল অনেক বড় বড় চৌড়ল হয়। সেখানে একজন তা বহন করতে না পারলে দুজনে মিলে তাকে বহন করে। এরপর শুরু হয় টুসুর বিদায় যাত্রা। কোন নদী অথবা বড় পুকুরে তাকে ভাসান করার জন্য। আর এক মাস ধরে তার স্মৃতি সম্পর্কের ব্যাখ্যা বেদনার গীত গাইতে গাইতে এগিয়ে চলে সমবেত মেয়েদের দল।

গীত

"১। তিরিশ দিন রাখলাম টুসু
তিরিশটি ফুল পালে গো আর রাখিতে লারি মাকে মকর হল্য বাদী গো।
রং:- টুসু ধনকে জলে দিব না
আমার মনে বড় বেদনা।
২। যাছ যাছ যাছ টুসু
ফিরে ডাঁঢ়াও আগনাতে
সম বছরের মনের কথা
বলে রাখ সাক্ষাতে।।"[১৯]

এরপর জলঘাটে পৌঁছে চৌড়লটিকে সমবেত ভাবে ধরে গভীর জলে ভাসিয়ে দেয়। জলে সকলেই স্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে। থালায় করে চিড়ে গুড়, বাতাসা, মিঠাই, বোঁদে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়। স্নান করার পর তা ভোগ হিসেবে সকলকে বেঁটে দেওয়া হয়। মা ও মেয়েদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও থাকে। তারাও ভোগ পেয়ে সকলেই খুশি হয়। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরম্পরা অনুসারে জল ঘাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে মেয়েরা উধোয়া গীত গেয়ে গেয়ে বাড়ি ফিরে। কিন্তু এই গীত আজ বিলুপ্ত। তাই আজ আর শোনা যায় না। এক মাস ধরে কৃষি সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় উৎসবটির সমাপ্তি ঘটে। বিকাল বেলা আগের দিনে গ্রামের প্রান্তে অনুষ্ঠিত হতো বেঝা বিধা বা বাৎসরিক তীরন্দাজি প্রতিযোগিতা। আর ফদি খেলা। কালের প্রবাহে এগুলি আজ হারিয়ে গেছে। মূল টুসু উৎসবের সঙ্গেও এইগুলির কোন সম্পর্ক নাই। টুসু বা মকর উৎসবকে উপলক্ষ্য করে গ্রামে গ্রামে, বিভিন্ন নদী-ঘাটকে কেন্দ্র করে বিরাট বিরাট টুসু মেলার আয়োজন হয়। পাশাপাশি তো বটেই দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ মেলাগুলিতে পশু ভাসান করতে আসে ও মেলা দেখতে আসে। এমন কিছু মেলা এই পুরুলিয়া জেলাতেই রয়েছে যেখানে লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। যেমন- শিলাই, কাঁসাই, দারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, সতীঘাটা, ইত্যাদি। এছাড়াও আখ্যান থেকে আরও কয়েকদিন বিভিন্ন গ্রামে হয় খেলাই চন্ডীর মেলা। ভাও বা ভান সিং মেলা। চারিদিকে শুধু উৎসব, মেলা, গীত এবং বাজনার অসাধারন আবহ।

তথ্যসূত্র:

১. মাহাত, তিলকা (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৬২)। হরিয়ালগাড়া, পুরুলিয়া (মঃফঃ), পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
২. করন, ডঃ সুধীর কুমার। সীমান্ত বাংলার লোক লোকযান। করুণা প্রকাশ, ১৪০২, পৃ. ১৬৭।
৩. মাহাত বঙ্কিম। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য। প্রকাশনী বাণী শিল্প, ১৯৭৮, পৃ. ১০৪।
৪. ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ। লোকসঙ্গীত রত্নাকর (তৃতীয় খন্ড)। এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি প্রাঃ লিমিটেড, ১৯৬০, পৃ. ২৬-২৭।
৫. মাহাত, বঙ্কিম। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য। প্রকাশনী বাণী শিল্প, ১৯৭৮, পৃ. ১০১।
৬. G.L. Possehl. The Indus Civilization. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 1630, Page. 147
৭. মাহাত, তিলকা (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৬২)। হরিয়ালগাড়া, পুরুলিয়া (মঃফঃ), পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
৮. করন, ডঃ সুধীর কুমার। সীমান্ত বাংলার লোক লোকযান। করুণা প্রকাশ, ১৪০২, পৃ. ১৭৫-১৭৬।
৯. মাহাত, তিলকা (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৬২)। হরিয়ালগাড়া, পুরুলিয়া (মঃফঃ), পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
১০. পুনুড়িয়া, নগেন (ক্ষেত্রসমীক্ষা- বয়স ৭০)। টিমাংদা, কোটশীলা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
১১. কল্পনা, মাহাত (ক্ষেত্রসমীক্ষা- বয়স ৫২)। গোলকুন্ডা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
১২. সরস্বতী, মাহাত (ক্ষেত্রসমীক্ষা- বয়স ৩৫)। উশিড়, চেলিয়ামা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
১৩. মাহাত, কিরীটি (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৬৭)। রামকৃষ্ণপুর, পাড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
১৪. মাহাত, সাইমনি, (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৪৮)। হাঁসলতা, কোটশীলা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
১৫. মাহাত, মমতা (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৪০)। পাঁড়রা, কোটশীলা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
১৬. মাহাত, মমতা (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৪০)। পাঁড়রা, কোটশীলা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
১৭. মাহাত, সাইমনি (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৪৮)। হাঁসলতা, কোটশীলা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
১৮. মাহাত, পুষ্পা রানী (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৪২)। আমডিহা, কাশিপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
১৯. মাহাত, কিরীটি (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৬৭)। রামকৃষ্ণপুর, পাড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

আকর গ্রন্থ:

১. করন, ডঃ সুধীর কুমার। সীমান্ত বাংলার লোক লোকযান। করুণা প্রকাশ, ১৪০২
২. মাহাত, বঙ্কিম। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য। প্রকাশনী বাণী শিল্প, ১৯৭৮
৩. সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ। ঝাড়খন্ডি লোক ভাষার গান। প্রকাশনী মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা-১, ১৩৭৮

অন্যান্য ঋণ:

১. মাহাতো ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র। মানভূম সংস্কৃতি। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬।